অতি গণতান্ত্রিক চর্চা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে

অধ্যাপক আবু সাইয়িদ

বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্টের জন্য জামায়াত নেতা মতিউর রহমান নিজামী ঢালাওভাবে দেশে 'অতি গণতান্ত্রিক চর্চা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা'য় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। একই দিনে অর্থমন্ত্রীও নিউজ পেপারওয়ালাদের একহাত ঝেড়েছেন। অবস্থাদৃষ্টে প্রতীয়মান হচ্ছে, সরকার সত্য প্রকাশে ভীত ও দিশেহারা। এ দিশেহারা হয়ে পড়ার লক্ষণটি সরকারের নাজুক অবস্থার প্রতিফলন। সরকার যে রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ–সরকারের নির্বাহী, বিচার বিভাগ ও আইন সভা কোনকিছুই যে ঠিকমতো চলছে না তা কোনক্রমেই আজ চেপে রাখা যাচ্ছে না। সরকার বিচার ব্যবস্থাকে এমন পর্যায়ে এনেছে যে, সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপ্রতি নিয়োগ নিয়েও নানাভাবে প্রশ্ন উঠেছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সরকার যে অঙ্গীকার করেছিল তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। দেড় ডজন বার সর্বোচ্চ আদালত থেকে বারংবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও সরকার নির্লজ্জের ভূমিকায় অবতীর্ণ, এখন পর্যন্ত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হয়নি। বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করলেও শুরু থেকেই নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে কমিশনের কার্যক্রম। এমনকি হাইকোর্টে কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছে, দাতাদের চাপের মুখে স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন করলেও এটি যাতে কার্যকর না হয় তার জন্য জেনেশুনেই চেয়ারম্যান নিয়োগকে বিতর্কিত করা হয়েছে। অন্যদিকে বিগত সংসদ অধিবেশনগুলো কোরাম ছাড়াই চলার রেওয়াজ চালু হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের পার্লামেন্টে ওয়াজ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রেকর্ড পরিমাণ সময় ও অর্থের অপচয় ঘটিয়ে সংসদ এখন বসছে শুধুমাত্র নিয়ম রক্ষার জন্য। সরকারের জবাবদিহিতা নেই, মন্ত্রীরা নিয়মিত সংসদে থাকেন না। সংসদ সদস্যরা সংসদে যান না। কেননা সংসদ সদস্যগণের মধ্যে শতকরা ৬২ ভাগ ব্যবসায়ী। তাঁরা ব্যবসা ও অর্থ উপাজনে ব্যস্ত। সংসদে যাওয়ার তাড়া নেই। প্রয়োজনও নেই। চলতি অধিবেশনে আঠারো কার্যদিবসের মধ্যে ষোলো দিনই সেজন্য কোরাম সঙ্কট। গণতন্ত্র চর্চার মূল কেন্দ্র হলো সংসদ। সংসদের এই বেহাল অবস্থার প্রেক্ষিতে কেউই দাবি করতে পারেন না, দেশে স্বাভাবিক গণতন্ত্র চর্চা চলছে। চর্চা বলছে লাঠিতন্ত্রের। মার ধর পেটাও। মিটিং-মিছিলে বাধা। সভাসমাবেশ অলিখিত নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে বন্দী। মৌলিক অধিকারগুলোকে সমুন্নত রেখেই গণতান্ত্রিক চর্চা করতে হয়। নির্বাচিত হলেই সরকার যে গণতান্ত্রিক হয় না তার প্রমাণ এই সরকার। দেশে বিনা বিচারে মানুষ হত্যা চলছে নানা বাহিনীর হাতে। যেটা সংবিধানবিরোধী। মৌলিক অধিকার হরণকারী। দেশের বিরাজমান অবস্থা, হত্যা, খুন, ধর্ষণ, নির্যাতন, আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে, দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধগতি, সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীদের বেপরোয়া উত্থান– এসব কিছুকে আর আড়াল করা সম্ভব নয়। গণতন্ত্র চর্চার অবশিষ্ট সুযোগটুকু যেখানে অনুপস্থিত, সে ক্ষেত্রে 'অতিগণতন্ত্র চর্চার' কথা বলা পাগলামি অথবা মিথ্যাচারের নতুন রেকর্ড। জামায়াত নেতা নিজামী ও অর্থমন্ত্রী বিগত প্রায় সাড়ে তিন বছরের কোন একটি দিনেও বাংলাদেশে খুন, হত্যা, ধর্ষণ হয়নি, দুঃশাসনের দাপটে জনজীবন অতিষ্ঠ থাকেনি তার উদাহরণ তুলে ধরতে পারবেন? আজ বাংলাদেশের অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে আমরা যেন মৃত্যু উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছি। জাতির অস্তিত্ব বিনাশী ভয়ঙ্কর সব কর্মকাণ্ড এমনভাবে চোখের সামনে সংঘটিত হচ্ছে, যা থেকে কোন নাগরিকই নিশ্চুপ বা নিরাপদ বোধ করতে পারে না। নির্বাহী বিভাগকেও লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে। অনিয়ম ও নৈরাজ্যের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। যেখানে রাষ্ট্রীয় কাঠামো অকার্যকর, দলীয়করণ, স্থবির, দুর্নীতি ও দুঃশাসনের বেড়াজালে বিপন্ন সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র চর্চার সামান্যতম সুযোগ কোথায়?

সংবাদপত্র রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিদিনের দিনলিপি। যা ঘটছে তারই প্রতিচ্ছবি মাত্র। সেই সংবাদপত্রের ওপর জামায়াত নেতাসহ সরকারী দলের আক্রোশ নেমে এসেছে। আসাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমানে সেই স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে এসেছে। যার ফলে দেশে-বিদেশে উঠেছে সমালোচনা। সমালোচনা সহ্য করার শক্তি থাকে স্বাভাবিকতায় দেশের সবকিছুই যখন অস্বাভাবিক তখন অতিগণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের অতি স্বাধীনতার কথা বলে নিজেদের ব্যর্থতার দায়ভার অন্যের কাঁধে তুলে দেয়ার এ এক মহাজনী পন্থা। কিন্তু এসব মিথ্যাচার বেশিদিন টেকে না। বিদেশের পত্রিকায় ও রিপোর্টে বলা হয়, সাংবাদিকতা বাংলাদেশে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পেশা। একের পর এক হত্যা করা হচ্ছে সাংবাদিকদের। নির্যাতন, গ্রেফতার, হুমকি-ধমকি সাংবাদিকদের নিত্যদিনের সঙ্গী। রাজনৈতিক দ্বিধাবিভক্তির কারণে এই পেশা থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধও গড়ে উঠছে না। সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করা দূরের কথা সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার কিংবা উপদেশ দেয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। পরিস্থিতির কারণে 'প্রেস ফ্রীডম' ক্রমশ হয়ে যাচ্ছে কাগজকলমের শ্লোগান। হিসাব অনুযায়ী বর্তমান সরকারের আমলে গত তিন বছরে সাত সাংবাদিক খুন হয়েছেন। নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৬৭৮ সাংবাদিক। হত্যা করার হুমকি কিংবা মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হয়েছে এক হাজার ২৩৬টি। গ্রেফতার হয়েছে ৪২ জন। এমন এক ভয়ার্ত পরিবেশে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের কাজ করতে হচ্ছে। গত '০৪ সালের ১১ মার্চ নিউইয়র্কভিত্তিক সংগঠন 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট' (সিপিজে) এক রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। এতে সাংবাদিকতা পেশার জন্য বাংলাদেশকে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ বলে উল্লেখ করা হয়। জুন মাসে সিপিজের একটি প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ সফর করে। দেশ ছাড়ার আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নানা প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে। এর আগে 'রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার' নামে আন্তর্জাতিক সংগঠন বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বিবৃতি দিয়েছে। জুলাই মাসে মার্কিন কংগ্রেসম্যানদের এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। এ ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে ঝুঁকির কথা উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা বিধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ নিয়ে সরকারের কোন মাথাব্যথা নেই। সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানের কোন পদক্ষেপই গ্রহণ করা হয়নি।

জোট সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের মাত্র পাঁচ মাসের মাথায় খুন হয় খুলনার দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র রিপোর্টার হারুন অর রশীদ। এরপর একে একে প্রাণ দিয়েছেন অনির্বাণ পত্রিকার শুকুর হোসেন, খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মানিক সাহা, জন্মভূমির সম্পাদক হুমায়ুন কবির বালু, নিউএজ পত্রিকার সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক নাবিল আবদুল লতিফ, খাগড়াছড়ির আজকের কাগজ প্রতিনিধি কামাল হোসেন। সন্ত্রাসীদের সর্বশেষ শিকার বগুড়ার প্রবীণ সাংবাদিক দীপঙ্কর চক্রবর্তী, খুলনার বিল্লাল। সাংবাদিক হত্যার এই সব ঘটনায় আজ পর্যন্ত অপরাধীদের গ্রেফতার করা যায়নি। ফলে সাংবাদিকদের ওপর নির্যাতন এবং হুমকির ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সাংবাদিকরা প্রতিনিয়ত হুমকির মুখে কাজ করলেও পেশার দিক থেকে তেমন কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠছে না। জানানো যাচ্ছে না জোরালো প্রতিবাদ। বিচার হয়েছে মাত্র তিনটির। নির্যাতন কিংবা হুমকির ঘটনা অসংখ্য। প্রতিদিনই কোন কোন স্থানে পত্রিকা পোড়ানো হচ্ছে। পত্রিকা বন্ধ করার দাবিতে মিছিল হচ্ছে। এত কিছুর পরও সবাই মিলে প্রতিবাদ হিসাবে একটি দিনের জন্য পত্রিকা বন্ধ রাখতে পারেনি। সাংবাদিক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদই এর কারণ বলে সাংবাদিক নেতারা মনে করেন। সাংবাদিক সমাজ আজ স্পষ্টতই দু'ভাগে বিভক্ত। বিগত বিএনপি সরকারের সময় সৃষ্ট দ্বিধাবিভক্তি এখনও অব্যাহত রয়েছে। সাংবাদিকদের সর্বোচ্চ সংগঠন 'বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন' নামে দু'টি পৃথক সংগঠন রয়েছে। ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের অবস্থাও তাই। স্বাভাবিকভাবেই এই ইউনিয়নের কার্যকারিতা থাকে না। সাংবাদিকদের ওপর কোন আঘাত এলে প্রতিবাদ সীমাবদ্ধ থাকে একটি সমাবেশ, কালো ব্যাজ ধারণ কিংবা একটি প্রতিবাদ মিছিলের মধ্যে। সিদ্ধান্ত নিয়ে সরকার কিংবা নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে কার্যকর চাপ সৃষ্টি তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সাংবাদিকদের দ্বিধাবিভক্তির সুযোগে সরকার কিংবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা থেকে যাচ্ছে নিরাপদে। যাকে খুশি

হত্যা করা হচ্ছে। দেয়া হচ্ছে হত্যার হুমকি। কারণ অকারণে গ্রেফতার হয়ে যাচ্ছেন সাংবাদিকরা। এমনকি বর্তমান সরকারের আমলে সাংবাদিকদের গ্রেফতার করে নির্মম নির্যাতন পর্যন্ত চালানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারী দলের থানা ওয়ার্ড পর্যায়ের নেতারা পর্যন্ত সাংবাদিকদের উপদেশের পর উপদেশ দিচ্ছেন। খুলনা প্রেসক্লাবের সভাপতি মানিক সাহা নিহত হওয়ার পর সাংবাদিকদের এক সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সাংবাদিকদের আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। নেতিবাচক দিক পরিহার করে ইতিবাচক দিক পত্রিকায় তুলে ধরা উচিত।' সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা গত বছর ২৯ মার্চ এক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'সাংবাদিকরা নিজেরাই নিজেদের ঝুঁকি তৈরি করছে'। সরকারের পূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির আরও এক দফা এগিয়ে বলেন, সাংবাদিকদের ভূমিকা পুলিশের চেয়ে খারাপ। অনেক সাংবাদিক সর্বহারা দলের সদস্য। অতিসম্প্রতি সাংবাদিকদের উপদেশ দিলেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর পুত্র তারেক রহমান। মন্ত্রী বা নেতাদের এ ধরনের বক্তব্য বা মন্তব্যের পরে সরকারের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের নিরাপত্তা বিধানের প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই গৌণ হয়ে যায়। সরকারের এই মনোভাবে সন্ত্রাসীরা হয়ে ওঠে উৎসাহিত। এক সাংবাদিকের জীবন কেড়ে নিতে তাদের কোন দ্বিধা থাকে না। এ কারণেই একের পর এক খুন হচ্ছেন সাংবাদিক। নির্মম নির্যাতনের শিকার হয়ে কিংবা জীবনের হুমকি মাথায় নিয়ে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত। অবাধ তথ্যপ্রবাহ ও সংবাদ প্রাপ্তির ক্ষেত্র আতঙ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। প্রতিনিয়ত সাংবাদিকদের মৃত্যুর মুখে, ভয়ের মুখে না রেখে সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে জিয়াউর রহমানের অনুসৃত পথ বেছে নেয়াই বর্তমান অবস্থায় শ্রেয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পরে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। জিয়াউর রহমান উপপ্রধান এবং প্রধান সামরিক প্রশাসক থাকাকালে তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। জিয়ার সময় জিয়ার বন্দনা ছাড়া কিছুই লিখতে পারেনি। লেখার স্বাধীনতা ছিল না, কলমের অধিকার ছিল না। তার উপর ছিল শাস্তি ও মৃত্যুভয়। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শাণিত সঙ্গিনের তলায় বিদ্ধ করেছেন। ১৯৭৬ সালের ৮ জানুয়ারি সামরিক ফরমান জারি করে বলা হয় 'কোন শব্দ, লেখায়, কথায়, চিহ্ন বা ইঙ্গিতে, আকারে প্রকারে, আচার, আচরণে সামরিক শাসক বা সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বিরূপতা প্রকাশ ও উস্কানি প্রদান করলে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হতে হবে।' আরও বলা হয়, 'সামরিক শাসক ও শাসনের বিরুদ্ধে কোন কার্যক্রম বিবৃতি, ভাষণ মুদ্রণ, প্রকাশ রক্ষণ বা বিতরণ করা হলে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড, অর্থদণ্ডসহ সম্পদ ও সম্পত্তির পুরো বা আংশিক বাজেয়াপ্ত করা হবে।' জারিকৃত এই ঘৃণ্য সামরিক ফরমানটি জিয়ার জীবতকাল পর্যন্ত লিখিত ও অলিখিতভাবে কার্যকর ছিল। প্রতিটি সংবাদপত্র অফিসে সামরিক, বেসামরিক, গোয়েন্দা সংস্থার লোক বসানো হয়েছিল। বেতার, টিভিতে সামরিক কর্মকর্তারা অফিসে বসতেন। সেন্সর করতেন। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, জিয়াউর রহমানের আমলে প্রকৃত ঘটনা ও সত্য প্রকাশ যাতে না হয় সে জন্য তিন হাজার পাঁচশ বাষট্টি বার প্রেস এমবার্গো দেয়া হয়েছিল, যেমন এরশাদের আমলেও দেয়া হয়েছিল দুই হাজার সাত শ'র বেশি। এই অবস্থায় সামরিক ফরমানের আওতায় ও সামরিক নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষিতে দেশের সংবাদপত্র ও সাংবাদিকগণ কেমন স্বাধীন ছিলেন? সেই একই ধারাবাহিকতায় শাসক গোষ্ঠীর ও উগ্র সাম্প্রদায়িক সশস্ত্র জঙ্গীবাদের শাণিত কৃপাণ আজ সাংবাদিকদের দিকে তাক করা হয়েছে। এতে লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি। ইতিহাস বলে বোমা, গ্রেনেড, হামলা, মামলা ও রক্তচক্ষু চিরকালই তীক্ষ্ণ কলমের নিকট পরাভূত।